রাজনীতি ও অন্ধ স্নেহ

পান্না খান

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে এই লেখার অবতারণা হয় নি। আপামর জনসাধারণ থেকে পাওয়া কথা থেকেই এই লেখার অনুপ্রেরণা। এই আপামর জনসাধারণ অর্থাৎ পনের কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো দু'এক কোটি বাদ যেতে পারে। যাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক হলো নিষ্কর্মা ও লোভী, কিছুসংখ্যক মার খেতে খেতে মার খাওয়াটাকেই আল্লাহ/ ভগবান/ ঈশ্বরের শাস্তি বলে মেনে নিয়ে নিশ্চুপ হয়েই থাকে, আর অবোধ শিশুরা।

১৯৭১ এ যেমন দেখা গিয়েছিল, দেশের আপামর সাধারণ জনগণের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সচেতন অংশগ্রহণ, তেমনি দেখা গিয়েছিল '৯০এ, সাধারণ জনগণের এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য করতে গণ জাগরনে অংশগ্রহণ। আর এখন মনে হচ্ছে, ২০০৭ এর ১১ ই জানুয়ারী জরুরী আইন জারীর পর ডঃ ফখরুদ্দিন আহমদের অনির্বাচিত সরকারের পরিচালনায় দেশ শাসন জনগণ নির্বিঘ্নে মেনে নিয়েছে।

প্রশ্ন করা যায়, কেন '৭১এ জনগণ একতাবদ্ধ হয়েছিল? সবাই এই উত্তরের সাথে একমত হবেন যে, পাকিস্তানী সরকারের শাসনের নামে দুঃশাসনে পুর্ববাংলার সাধারণ জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল এবং দুঃশাসনকে চ্যালেঞ্জ করার মত নেতৃত্বও তৈরী হয়ে ছিল। একই ধরণের গণজাগরন '৯০এ কেন হয়েছিল? উত্তর সেই একই, এরশাদের দুঃশাসনে বাংলার জনজীবন অতীষ্ঠ হয়ে উঠছিল, এবং সেই দুঃশাসনের সমাপ্তি টেনে, দেশ পরিচালনায় জনগণের আস্থার সম্ভাবনার উদয় হয়েছিল, ভূতপুর্ব নেতৃত্বের নতুন সংস্করণের প্রতি । ২০০৭ এ জনগণ কেন এই অনির্বাচিত সরকারের দেশ পরিচালনা প্রতিবাদহীণ হয়ে মেনে চলেছে? কারণ, পুর্বতন নেতৃত্বের নতুন সংস্করণগুলির দেশ পরিচালনার প্রতি জনগণের আস্থা সম্পুর্ন ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ও অনির্বাচিত এই সরকারের পদক্ষেপসমুহ জনগণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই আশা করে ছিল।

কোন কারণসমূহের জন্য সাধারণ জনগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছিল?

'৭১এর পরে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, '৭৫এ নির্মমভাবে জাতির পিতার হত্যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন নেতৃত্ব মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। এমনকি নেতৃত্বের নতুন সংস্করণ গড়ে উঠতে লেগে যায় অনেক বছর। কেন অবিলম্বে নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হয়ে গড়ে ওঠেনি? সে কি '৭১ থেকে '৭৫ এ সরকার পরিচালনায় সুশাসনের অঙ্গীকার দিয়ে তাকে পালন না করার ভয়ে? না কি সেই চার বছরের সরকার পরিচালনায় আপামর জনগণ বিরোধী কিছু পদক্ষেপ, যা জনমনে বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল, সেই বিদ্রোহের সুত্রপাতের ভয়ে? অবশ্য যুক্তি খন্ডনের জন্য যুক্তি অনেকেই টেনে আনা যায় যে, জাতির পিতার হত্যার পরপরই তো নেতৃস্থানীয় নেতাদেরও হত্যা করা হয়েছিল। পাকিস্তানী হানাদাররা তো দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল, গেরিলা যুদ্ধের কারণেও দেশের অনেক ক্ষতি হয়েই ছিল। ভাঙ্গা দেশ, নতুন দেশ গড়া, সে যে অনেক দায়িত্ব, সেই ৭১-৭৫, ভুল একটু- আধটু তো হতেই পারে! কিন্তু পাল্টা প্রশ্নও কি আসে না যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ জনগণের মাঝে যে জাগরণের জোয়ার এসেছিল, তা তো প্রজ্জলিতই ছিল ততক্ষণ, যতক্ষণ নেতৃত্বের মাঝে অসাধুতার চর্চা, সাধারণ জনগণকে কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ, বংগবন্ধু তার ভাষনে কি বলেন নি যে, তিনি তার চারপাশে চোরদের উপস্থিতি দেখেন! কারা এই চোর আর কি চুরি করে চলেছিল? বংগবন্ধুর আশেপাশে, অর্থাৎ বংগবন্ধুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাদেরই মাঝের বেশ কিছু ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়-স্বজন; আর চুরি করছিল রাষ্ট্রীয় জিনিষ। দেশ যেমন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তেমনি দেশ গড়ার জন্য বিদেশী সাহায্য ও দেশের উদ্যমী ও নির্লোভ জনশক্তিও তুলনামুলকভাবে কম ছিলনা । কিন্তু নেতৃত্বের মাঝে উচ্চপদস্থ নিষ্কর্মা, লোভী ব্যক্তিবর্গ, বঙ্গবন্ধুর নাকের ডগার আয়ত্বে থেকে চুরি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে দেশটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছিল। সেসময় নেতৃত্ব-প্রধান শুধু চোর চোর করে চেঁচিয়েছেন, কিন্তু চোর ধর বলে কার্যকর পদক্ষেপ নেন নি বা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন নি, কারণ কি অন্ধস্নেহে শাসনে অক্ষম? নেতৃত্ব ও প্রশাসনের প্রহসনে জনজীবন এক দ্বিধাযুক্ত নিদারুন কষ্টের তীরহারা সমুদ্রে ভাসছিল। যেহেতু, বঙ্গবন্ধু নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তার আশেপাশের চোরদেরই শায়েস্তা করতে পারছিলেন না, শুধু বক্তব্যের হাহাকার ছাড়া। সুযোগ পেয়ে প্রধান নেতৃত্বকে গুরু মেনে তখন দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রশাসনে অনিয়ম, চুরি, স্বজন প্রীতি, যা জনজীবনকে অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বাষ্পায়িত গণঅসন্তোষের সুযোগে কিছু ব্যক্তিবর্গ মেতে ওঠে খুনের হোলিখেলায়। জাতি লজ্জাজনক ওচরম নিন্দনীয়ভাবে হারায় জাতির পিতাকে।

জাতির পিতার হত্যার পর সেই দল নতুন সংস্করণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেরি করেছে অনেক বছর। কারণ, নেতৃত্বের যে নতুন সংস্করণ হয়েছে, তাতে পুরোনো মদই নতুন বোতলে ঢালা হয়েছে, অর্থাৎ পুরোনো মানুষেরাই ভিন্নতর পদ নিয়ে দল গঠিত করেছেন। যেহেতু, দলের নতুন সংস্করণ তাদের পুর্ব সাফল্য ও অসাফল্যের কারণ পর্যালোচনা করে কিছু পরিমার্জন, সংস্কার বা শুদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে শুধু ক্ষমতা অর্জনেরই স্ট্র্যাটেজি করেছে। তাই ক্ষমতায় গিয়ে নতুন সংস্করণ তাদের ৭১-৭৫ এর কার্যাবলী আরো বিভৎস ভাবে উপস্থাপিত করে জনসাধারণকে ৭১-৭৫ এর দুর্বিষহ দিনগুলিকেই মনে করিয়ে দিয়েছে। উদাহরণে জনগণের মনে পড়ে, সন্ত্রাসী জয়নাল হাজারীর কার্যকলাপে জনগণের ভীতি খবর মাধ্যমে প্রকাশ হলে প্রধাণমন্ত্রী শেখ হাসিনার তাকে সন্তানতুল্য ঘোষনা দিয়ে আইন ও বিচার থেকে স্নেহের আঁচলের তলায় রক্ষা করা। আবার ডঃ ইকবাল কর্তৃক দিনের সুস্পষ্ট আলোয় মিছিলে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ও হত্যাকে তৎকালীন একই প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অজুহাতে পাশ কাটানো। জনগণের মনে করিয়ে দেয়া হয়, সিরাজ শিকদারের মৃত্যু। আত্মগোপনকারীকে ধরে বংগবন্ধুর সামনে নিয়ে গেলে মত ও পথের পার্থক্যের উপর তাদের প্রচন্ড বাকবিতন্ডা হয় সত্যি; কিন্তু সেই লোকের নীতিতে ছিল না ধৃত অবস্থায় পালানো,তবু সেই অজুহাতেই তার হত্যা সাধিত হয়। আজ হাসিনার হৃদয়ে যেমন তার পিতার অপমৃত্যুর জন্য রক্তক্ষরণ হয়,তেমনি হয় সিরাজ শিকদার তনয়াদেরও। তবে কিছু পার্থক্য তাও থেকে যায়ঃ - প্রকাশ্য দিবালোকে হলেও সিরাজ শিকদারের হত্যা ডঃ ইকবালের মতো শত শত লোকের উম্মিলীত চোখের সামনে হয় নাই। জনমনে ভয় তাই আরো বেশী, ক্ষমতায়

থেকে এই রাজনৈতিক দল যদি প্রকাশ্যেই একাধিক প্রাণ নেবার পর তার সুষ্ঠু বিচারের ব্যবস্থা না করে, তবে আড়ালে শতাধিক গুপ্তহত্যা তো এই দলের কাছে নস্যি!। ফলস্বরূপ, দ্বিতীয়দফা নির্বাচনে ভরাডুবি। হায় রে, হাসিনার স্নেহ ও অন্ধ স্নেহ! তাই তো বিদেশে ও দেশের জনসাধারণের মনে প্রশ্ন, কর্মীদের প্রতিই যার এত স্নেহ, গর্ভজাত সন্তানদের প্রতি সেই স্নেহ কি নৈব নৈব চ? তাই তো জনমনে প্রশ্ন, কোন সুত্র থেকে অর্থের যোগান পেয়ে তারা বিদেশের মাটিতে আর্থিকভাবে এতই সুপ্রতিষ্ঠিত? শেখ হাসিনার ক্ষমতায় আরোহনের আগে তার সন্তানদের আয় অনুপাতে ব্যয় ও আর্থিক অবস্থান যা ছিল, হাসিনার হাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাবি হস্তান্তরের পরে, ২০০১ এর পর তাদের আর্থিক উত্থান আমেরিকা প্রবাসী সাধারণ বাঙ্গালী ও দেশের জনসাধারণকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সকলের মাঝে আরো প্রশ্ন আসে, আমাদের মতো দরিদ্র রাষ্ট্রপ্রধানের ও দলপ্রধানের বেতন ভাতা কত যে, বছরে দুবারেরও বেশী ব্যক্তিগত কাজে তিনি বিদেশ পাড়ি দেয়ার অর্থের যোগান দিতে পারেন? বা রাষ্ট্রীয় ভাগাড় থেকে নিতে পারেন? প্রশ্নটি শুধু বাঙ্গালীদের নয়, বিদেশীদেরও- যারা আমাদের দেশের সরকারের হাহাকারে সাহায্যের (শর্ত সাপেক্ষে)/ ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে আমাদের সরকারকে উদ্ধার করতে যায়।

তখন ইয়াজউদ্দীনের আমল, রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন স্থিতি শীলতা নেই। গুজবের সমুদ্র পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়েই, তাতে কান পাতা দায়। মিটারযুক্ত সি এন জিতে চড়ে, পায়ে হেঁটে জনগণের চিন্তা চেতনার খবর নিতে জনারণ্য চষে বেড়াচ্ছেন এক সাংবাদিক। সব সি এন জি চালকই ভাড়া চেয়ে বসেন মিটারের চাইতে ১০/ ২০/৩০ টাকা কিংবা তারও বেশী। টুক করে পট পরিবর্তন হয়ে গেলো; জরুরী অবস্থা জারী। প্রথমে সি এন জি চালকরা কড়া সুর নামিয়ে স্বাভাবিক সুরে বেশী দর চাইলো। তারপর যখন ধরপাকড় কেবলই শুরু হয়েছে, বাতাসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটা গুনগুনানিও শুরু হয়েছিল। সাধারণ মানুষ অত শত বুঝে না, কিন্তু একটু আধটু বুঝে। তাই, সি এন জি চালক আর মিটারের চেয়ে বেশী চায় না। কি ব্যাপার?
সি এন জি চালকের বক্তব্য। সবার কপালে তো আর লেখাপড়া জোটে না। তাই তারা খেটে খাওয়ার একটা উপায় জোগাড় করে। খাটনির নায্য মুল্য পেলে খদ্দেরের সাথে ক্যাট ক্যাট করতে কার ভাল লাগে? সি এন জির মালিক এক কলেজ মাষ্টার, তার সংসারের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য মাষ্টারীর বেতন আর সি এন জির আয়ই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কলেজ ও সি এন জি সংক্রান্ত আয়ের এক বিরাট অংশ যখন চাঁদার নাম করে কিছু বখাটে ছাত্র, মাষ্টার আর বখাটে ব্যবসায়ীরা নিয়ে যায়, মাষ্টারের তখন বাড়তি আয়ের জন্য সি এন জি চালককেই বলতে হয়, ভাড়া বাড়িয়ে নেয়ার জন্য। সি এন জি চালকও বাধ্য হয়ে ক্যাট ক্যাট করতো। ধর পাকড় শুরু হতেই এইসব বখাটেরা ডুব দিয়েছে আর মাষ্টার সাহেবও সি এন জি চালককে বাড়তি দাম না নেবার আদেশ করেছেন।
আমাদের আপামর জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র বোঝবার জন্য খুবই ছোট্ট চিত্র। কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বালুকনা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল?
আর সেজন্যই, অনির্বাচিত সরকার সদ্য তখত থেকে বিদায় নেয়া সুবিখ্যাত বখাটে তথা দুর্নীতিদুষ্টদের যেভাবে আটকাচ্ছেন বা শাসনের আওতায় ঠেলে দিচ্ছেন, তাতে সাধারণ জনগণ কিছু বুঝুক বা না ই বুঝুক; অন্ততঃ চুপ চাপ তাদের দেশ পরিচালনা মেনে নিয়েছিল। সিংহাসনে বসে সম্রাজ্ঞী ও সম্রাজ্ঞীপুত্রদের অঙ্গুলী হেলনে যে চাঁদাবাজী, দুর্নীতির সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তাতে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল জনগণ। ৭১-৭৫ এর মতোই দেশজুড়ে ছিল এদের পদলেহনকারী ও স্বার্থান্বেষী সুবিধা গ্রহণকারী। দুর্নীতির উৎসধর তখতে ক্ষমতাসীনরা (হাতে গোনা কয়েকজন বাদে) ও তাদের অনুসারীরা ছাড়া দেশের আপামর জনগণ প্রত্যাশায় ছিল এক অসম্ভবের যাদুকাঠির ছোঁয়ার। যেটাতে তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। সেই অসম্ভবের যাদুকাঠির আস্বাদ পেয়ে সাধারণ জনগণ চুপ চাপই মেনে চলছিল অনির্বাচিত সরকারকে। অবশ্য চুপ চাপ থাকতে পারে নি নেতৃত্বের নতুন সংস্করণের প্রধাণেরা। প্রথম দিকে এক প্রধাণ তো অনির্বাচিত সরকারকে সাবাস সাবাস করে পিঠ চাপড়াতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু যেই না সেই নেতৃত্বের সময়কালীন নষ্টামীর গুরুদের দিকে এই সরকারের আইনের হাত প্রসারিত হওয়া আরম্ভ হয়েছে, দলপ্রধানের সাবাসীর সুরও খাদে নামছে। এখন তো অনির্বাচিত সরকারকে এক হাত দেখে নেব এর সম্পর্কে নেমেছে।
জনগণ আবারো নিরাশায় অসুস্থ। আর কত কুবিখ্যাত নেতৃত্বদের নতুন সংস্করণদের অন্ধ স্নেহের ভোগ হবে জনগণ?

কারণ, জনগণ রাজনীতির মারপ্যাচ খুব সুক্ষভাবে না বুঝলেও জানে যে, সাবাস দেয়া নেতৃত্বের সুর যখন খাদে নামছিল, অনির্বাচিত সরকার কর্তৃক ভদ্রভাবে তাকে দেশে ফেরত না আসতে বলা ও ভদ্রভাবে আরেক নেতৃত্বকে দেশ ছাড়তে অনুরোধ না করে যদি দুই নেতৃত্বকেই তাদের স্বয়ংকৃত বা তাদের আমলে এবং প্রশয়ে ঘটিত অপকর্ম (যা আইনগতভাবে গুরুদন্ডনীয়), তেমন কাজের বিরুদ্ধে তেমনি গুরুতর আইনের ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করায় সচেষ্ট হতো, হয়তো অনির্বাচিত সরকারের প্রতি এই নেতৃত্বদের ধমক দিয়ে চেঁচানো সৃষ্টি হতো না। কারণ এই নতুন সংস্করণের নেতৃবর্গ ভালভাবেই জানে, পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের পনের কোটি মানুষের মধ্যে এক লাখ বা ততোধিক নিষ্কর্মা ও লোভী কর্মী পাওয়া খুবই সোজা, যার প্রমাণ তারা তাদের তখতে থাকাকালে জেনে গেছে। এই নিষ্কর্মা ও লোভী কর্মীরা বর্তমানে তাদের নেতৃত্বের গুণগান ও জয়গান গেয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে বিশ্বের কাছে তাদের নেতৃত্বকে নির্দোষ ও অনির্বাচিত সরকার কর্তৃক অত্যাচারিত দেখিয়ে দেশের মাটিতে নিতে ও রেখে দিতে পারবে। কারণ, এই নিষ্কর্মা লোভীরাও বেশ ভালভাবেই জানে যে, ভবিষ্যতে তাদের নেতৃত্বকে দেশে রাখতে পারলে নেতৃত্বদের দ্বারা চোরের মার বড় গলা শুরু করে অনির্বাচিত সরকারকে টালমাটাল করা যেতে পারে। যেহেতু অনির্বাচিত সরকারের কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য ক্ষমতায় যায় নি, তাই হয়তোবা দুইনেতৃত্বের কল্পনাতীত হট্টগোলে তারা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে বিদায়ের সুর তুলতেও পারে। তাতে যদি নতুন সংস্করণদুটির কেউ ক্ষমতায় আরোহন করেই ফেলে, তবে তো নিষ্কর্মা ও লোভীদের কেল্লা ফতে। দলের নামে নিষ্কর্মা ও লোভী জনগোষ্ঠী টেবিল চাপড়ে গুলতানি মেরে ও প্রতি মিছিলে রেকর্ড ব্রেক করা মানুষের যোগান দিয়েই হাই স্ট্যাটাস নিয়ে বিরাট ব্যবসায়ী বনে যেতে পারবে বা চাকুরিতে নিয়মবহির্ভুত প্রমোশন নিয়ে চাকুরির সারির উচ্চস্তরে গিয়ে নিজের প্রয়োজনমত অফিসকে ব্যবহার করতে পারবে; উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারকরাও আইনের প্যাঁচ কষে এই নেতৃত্বদের দেশে রেখে হই চই বাধিয়ে তাদের উচ্চাশা চরিতার্থের জন্য বিচার বিভাগের অপব্যবহার করতে পারবে।

এটা দেশবাসী এতদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে, লঙ্কায় গেলে রাবন হয়, প্রবাদের মতোই ক্ষমতায় গেলেই অর্ধেকের বেশী ক্ষমতাসীনদের আর্থিক উন্নতির এতোই প্রসার ঘটে যে, তাদের মিছিলে ভুখা নাঙ্গাদের আশাতীত অর্থ দিয়ে মিছিলে শ্লোগান দেওয়াতে ও মিছিলে আশাতীত মানুষের সমাগম ঘটাতে কোনই বেগ পেতে হয় না। যা দেশ ও বিশ্বকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, জনগণ অনির্বাচিত সরকারের বিপক্ষে আর ঢেকে দেয় নেতৃত্বদের ক্ষমতায় থাকাকালীন দুই নেতৃত্বদের কর্তৃক জনগণের নাভিশ্বাস তুলে দেয়া পুকুরচুরি।

আপামর জনসাধারণ যতোই কম বুঝুক না কেন, মনের গহীনে চায় দুর্নীতির মুলোৎপাটন। তাই, অনির্বাচিত সরকারের দ্বারা শক্ত আইনের হাত দিয়ে দুর্নীতিদুষ্টদের শাস্তিদানের দিকে চেয়ে রয়েছে জনগণ। কিছু সময় লাগুক, তবু দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য হোক সঠিক ভোটার লিষ্ট। কোন কোন ঠোঁট কাটাদের বলতে একটুও দ্বিধা হয় না যে, এইসব দুর্নীতির সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞীপুত্র, রানী, রানীপুত্র, রানীকন্যাদের নির্বাসিত করার আইন যদি থাকতো, নেতৃত্বদের অন্ধস্নেহের খেসারতের সমুদ্রে ডুবে জনসাধারণকে আর পুনরায় দুঃখে পড়তে হতো না। অনির্বাচিত সরকারের কার্যাবলীর দিকে জনগণ আশা করে আছে যেন, লোলুপ-নিষ্কর্মা রাজনীতিবিদদের শক্ত আইনের রশি তৈরী করে বেঁধে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। জনগণের দুঃখ যে, যে নেতৃত্বদের চোখের ডগায় দুর্নীতির সম্রাজ্ঞীপুত্রগণ ও নিষ্কর্মা লোভী নিজ দলীয় দুর্নীতিবাজগণ বছরের পর বছর রাজনৈতিক পদে থেকে ভয়াবহ দোষ করে আইনের দ্বারা নিন্দিত হয় না, সেই নেতৃত্বদ্বয় কিসের ভিত্তিতে জনগণকে বিশ্বাস করতে বলে যে, তারাই দলের প্রধাণ থেকে দলে গণতন্ত্রের স্থাপনা ও দলে সংস্কার করবেন?

হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় বেশ কিছু মানুষের উপস্থিতি দিয়ে তার জনপ্রিয়তার আকাশচুম্বিতা দেশে ও বিদেশে বোঝানো তো খুবই সোজা। খালেদা কর্তৃক তাকে মৌখিক শুভেচ্ছা দিয়ে এও বোঝানো সম্ভব যে, দেশের উচ্চপর্যায়ের দলগুলির মধ্যে সহনশীল সম্পর্কও রয়েছে। কিন্তু এই আইওয়াশ দিয়ে জনগণকে আবারো অসহনশীল অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য দুই দলই যে কোমর বাঁধছে, তাতে জনগণ আতঙ্কিত।